রিইউনিয়ান

সুব্রত রায়

দিনের মধ্যে অনেকটা সময় ওঁদের চার দেওয়ালের মধ্যে কাটতো। ওরা তখন সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছে গেছে। সকলের বয়স কুড়ির আশেপাশে। তারপর একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করে ওরা ছড়িয়ে পড়লো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কয়েকজন বিদেশে পাড়ি দিলো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশকে স্বদেশ বানিয়ে সেখানে স্থায়ী ভাবে রয়ে গেলো। এরপর চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখলেও সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ আর নেই। নাম মনে পড়লেও মুখ মনে পড়ে না। আবার অনেকের মুখ আবছা আবছা মনে পড়লেও নামটা কি যেন ভাবতে হয়। চল্লিশ বছর পর সেই ৫০ জনের ৩০ জন আজ কলকাতায় জড়ো হবে কিছুক্ষণের জন্য পুরানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য। শান্ত প্রায় একবছর ধরে চেষ্টা করে সবার নাম ঠিকানা জোগাড় করেছে। ই-মেল আর টেলিফোনের দৌলতে পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে। হাজির থাকতে বলেছে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের গাড়ি বারান্দার তলায় সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে। বাসে করে ওরা যাবে চম্পাহাটি। সারাদিন কাটবে এক বাগানবাড়িতে। সকলকে হাজির করা গেল না, গেলে ভালো হতো, শান্ত নিজের মনে বললো।

শান্ত সবার আগে হাজির হয়ে রূপাকে গাড়ি বারান্দার তলায় বসিয়ে ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগলো। ঘড়িতে পৌনে আটটা। চল্লিশ বছরের স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। হঠাৎ নজরে পড়লো লেকের দিক থেকে এক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে। ভদ্রলোকের হাঁটার ভঙ্গিটা খুব চেনা। এতদূর থেকে শান্ত তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। শান্ত ঐ দিকে এগিয়ে গেল। ওরাও খানিকটা কাছে এসে পড়েছে। অরূপ না? শান্ত নিজের মনে বললো। শান্ত আর একটু এগিয়ে গেল।

- অরূপ?

- শান্ত?

- তোর মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি গেল কোথায়?

- তুই কিন্তু একদম একই রকম দেখতে আছিস। বয়সের ছাপ পড়েছে এই যা। জয়া আমার বউ।

শান্ত হাত জোড় করে নমস্কার করে জয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

- কিরে প্রথম দর্শনে আমার বউকে পছন্দ হয়ে গেল?

- কি ছ্যাবলামি করো - জয়া অরূপকে মৃদু ধমক দিলো।

শান্ত এইসব গায়ে না মেখে জয়াকে বললো - তোমায় কোথায় দেখেছি বলতো? জয়া শুধু হাসলো। কোনও উত্তর দিলো না। অরূপ বললো - no chance brother। জয়ার জীবনের

উনত্রিশটা বছর কেটেছে কার্ডিফে। তারপর একত্রিশটা বছর আমার সঙ্গে বাঙ্গালোরে। বছর পাঁচেক আগে ঢাকা থেকে ফেরার পথে দু-দিন আমরা এই রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট-হাউসে ছিলাম। জয়ার জ্বর ছিল, তাই প্রায় পুরোটা সময় আমরা গেস্ট-হাউসে ছিলাম। একবার শুধু কিছুক্ষণের জন্য দক্ষিণাপনে গিয়েছিলাম। সেই হিসাবে জয়ার এটা দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসা। কলকাতায় আমাদের দুজনের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই।

ওরা তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি বারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালো। শান্ত বললো - এই আমার বউ রূপা। তোরা এখানে বোস। রূপার কাছে নামের লিস্ট আছে। মোট আমাদের ক্লাসের তিরিশ জন আসবে বলে কনফার্ম করেছে। আর স্পাউসদের ধরলে মোট ৫৫ জন হবে। আসার সঙ্গে সঙ্গে লিস্টে টিক দিয়ে রাখিস। চিনতে না পারলে কোনো রকম লজ্জা না করে নাম জিজ্ঞাসা করবি।

(২)

সাড়ে আটটা তো বাজলো। সবাই কি এসেছে - মিহির জিজ্ঞাসা করলো। অরূপ গাড়ি বারান্দার তলার থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিলো - অজিত ছাড়া সবাই এসে গেছে। এ ছেলেটা জীবনে কোনোদিন সময় রাখতে পারলো না - শুক্লা বললো। বলতে বলতে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। অজিত হন্তদন্ত হয়ে বউকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামলো। মিহির বললো - আচ্ছা তুই কোনও দিনই সময় মতো আসতে পারিস না কেন? অজিত বললো - আসলে কি জানিস আমি রাস্তায় নামলে রাস্তাটা কেমন যেন লম্বা হয়ে যায়। শুক্লা বললো - আইনস্টাইনের নিশ্চয়ই তোমার মতন কয়েকটা বন্ধু ছিল। তাদের দেখে স্পেশাল থিয়োরি মাথায় এসেছিল, এক এক জনের ঘড়ি এক এক গতিতে চলে। দুনিয়ায় এক ঘড়ি বলে কিছু নেই।

শান্ত বললো - সবাই বাসে উঠে পড়ো। অরূপ তুই বাসে উঠার সময় হেড কাউন্ট কর।

আমাদের চম্পাহাটি পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। সকলে ব্রেকফাস্ট বাসে করে নাও - শান্ত বললো। শম্পা বললো - আচ্ছা রত্না, তোদের বিয়েটা কি করে হলো? অজিতের যা সময় জ্ঞান তোর তো লগ্নভ্রষ্টা হবার কথা। রত্না অজিতের দিকে তাকিয়ে বললো - বলবো গল্পটা? অজিত ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে বললো - তোমার ইচ্ছে হলে বলো। রত্না সুরু করলো - আমাদের দু-বাড়ির মধ্যে বিয়ের আলাপ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিলো। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা কলকাতা থেকে ফিরে মাকে বললেন, গিন্নি মেয়ের বিয়ে পাকা করে এলাম। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, সরকারি গবেষণাগারে বিজ্ঞানী, ভালো কাজকর্ম করছে। মা দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, দুগ্‌গা দুগ্‌গা। বাবা বললেন, যা খবর পেলাম ছেলেটির সময় জ্ঞান একদম নেই। একজন তো আমাকে সাবধান করে বললো, বিয়ের দিন লগ্ন পার হয়ে যাবার আগে

ছেলেটিকে হাজির করতে পারবেন তো? মা বললেন, তাহলে কি হবে? বাবা হেসে বললেন, এত বছর ছেলে চরিয়ে খাচ্ছি এমন প্যাঁচ কোসবো বাবাজী লগ্ন সুরু হওয়ার আগেই হাজির হবে। বাবা প্রথমে ওঁর বাবা মানে আমার শ্বশুর-মশাইকে বুঝিয়ে দিলেন স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের রাস্তা খুব খারাপ। একটু বৃষ্টি পড়লে গাড়ি চলেনা। হয় গরুর গাড়ি অথবা হেঁটে ন-কিলোমিটার আসতে হয়। তাই বিয়ের আগের দিন বর আর বরযাত্রীরা যেন চলে আসে। থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা থাকবে। ওঁর বাবা রাজি হয়ে গেলেন। বাবা এবার পালোয়ানদাকে ডেকে পাঠালেন। পালোয়ানদার আসল নাম যে কি কেউ জানে না। বিরাট চেহারা আর গায়ে দারুণ জোর, তাই তার নাম পালোয়ান। বাবা বললেন, পালোয়ান পরশু আমার মেয়ের বিয়ে। তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। বিয়ের দিন যেন লোড শেড না হয়। আর বিয়ের দিন তুমি তোমার দলবল নিয়ে বিকেল বেলায় হাজির থাকবে। দরকার হলে বরকে সময়মত ধরে আনতে হবে। পালোয়ানদা বললো, এ আর এমন কি কাজ। লোড শেড যাতে না হয় আমি এখনি দেখছি। বলে সাইকেল নিয়ে চার মাইল দূরে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিসে চলে গেল। অফিসের বড় কর্তা সবে লাঞ্চ সেরে চেয়ারে বসে ঝিমচ্ছেন এমন সময় পালোয়ানদা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। পরশু মাস্টার-মশাইয়ের মেয়ের বিয়ে। আমাদের গ্রামে যেন লোড শেড না হয়। লোড শেড হলে আমি দলবল নিয়ে আসব। আর আপনাদের সবাইকে ঠ্যাং ধরে মাথা নিচু করে ঐ ডোবায় চোবাবো যতক্ষণ না যথেষ্ট জল খাওয়া হয়।

বিয়ের দিন পালোয়ানদা তার দলবল নিয়ে দত্ত-বাড়ির নীচে পাঁচটা নাগাদ হাজির। বর ও তার কয়েকজন বন্ধুকে আমাদের প্রতিবেশী দত্তদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিয়ের লগ্ন ছিল ৬টা ৩২ মিনিটে। ৬টা ১০ নাগাদ বাবা আমাদের বাড়ির ছাতে উঠে একটা লাল রুমাল নাড়তে লাগলেন। ওমনি পালোয়ানদার দল হারে রে রে করতে করতে দত্ত-বাড়িতে ঢুকে পড়লো। ইনি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করছিলেন। পালোয়ানদার দল কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এনাকে চ্যাংদোলা করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলো। ইনি তখন ছটফট করছেন। পালোয়ানদা এক ধমক দিলো, বিয়ে করতে যাবে এত ছটফট করছো কেন? ঐ ডোবাটা দেখেছ? ওতে ফেলে দেব। জান, ওর মধ্যে একটা সিন্ধুঘোটক থাকে। ডোবার মধ্যে সিন্ধুঘোটক? তিন চার জন একসঙ্গে বলে উঠলো। রত্না আবার সুরু করলো - আমি ঐ একই কথা পালোয়ানদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। পালোয়ানদা বললো, সিন্ধুঘোটকের ইচ্ছে হলে ডোবাতে কেন আমার বাড়ির বড় চৌবাচ্চায় থাকতে পারে। তাতে তোমার আপত্তি করার কি আছে? আসলে বাবাজীকে একটু ভয় দেখাবার দরকার ছিল। সিন্ধুঘোটক মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, আর তাতেই কাজ হয়ে গেল। তারপর হারে রে রে করতে করতে পালোয়ানদার দল বর বাবাজীকে মিনিট খানেকের মধ্যে বিয়ের সভায় হাজির করলো। তার তখন কোঁচা মাটিতে লোটাচ্ছে, পাঞ্জাবির বোতাম খুলে গেছে, চুল উসকোখুসকো, চন্দন লেপটে গেছে। বাবা সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পাড়ার দুই বৌদি চন্দন নিয়ে তৈরি ছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। আমার মেসোমশাই ধুতি পরিয়ে দিলেন। হিরু নাপিত চুল ঠিক করে

দিলো। মোটকথা সাড়ে ছটার মধ্যে বর একদম রেডি। বিয়ের পর এনার কি হাম্বি-তাম্বি। আমার পরে জোর খাটানো হয়েছে। বাড়ি ফিরে এফ-আই-আর করবো। শ্বশুর-মশাই সব কথা শুনে বললেন, ছি ছি। কত বড় বংশের ছেলে তুই। আমার ঠাকুরদা ঈশ্বর রাইচরণ বাঁড়ুজ্যেকে সাতটা গ্রামের লোকেরা মাথা বলে মানতো। আর তোর জন্য যদি মুখুজ্যে মশাই-এর মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতো তাহলে সমাজে আমি মুখ দেখাতাম কি করে? না না বেয়াই-মশাই আপনি ঠিক কাজই করেছেন। আপনার জন্য আমার মুখ রক্ষা হলো। বাবার এই রূপ দেখে ইনি তখন ল্যাজ গোটালেন। শান্ত বললো - অজিতের আর একটা গল্প শোনো। এ গল্পের খানিকটা আমার শোনা আর খানিকটা বানানো। তবে তাতে রসভঙ্গ হবে না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটা Science Advisory Committee আছে। অজিত তার একজন মেম্বার। একটা সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি মিস্টার মেনন প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, স্যার আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি বুধবার Science Advisory Committee-র খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমার মনে আছে। গতকাল মাঝরাত পর্যন্ত আমি ডক্টর মুখার্জির রিপোর্টটা পড়েছি। মার্জিনে আমার বক্তব্য লেখা আছে। রিপোর্টটা আমার টেবিলে আছে। আপনি দেখে নিতে পারেন। মিস্টার মেনন বললেন, স্যার একটা সমস্যা আছে। মিটিং এগারোটায়। ডক্টর মুখার্জি তিনটার সময় হাজির হয়ে বলতে পারেন, একটু দেরি হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, দিল্লি এয়ারপোর্টে নামলে ওঁকে পাকড়াও করে আমার এখানে নিয়ে আসা যায় না? মিস্টার মেনন বললেন, তার আগে তো কলকাতা এয়ারপোর্টে সময়মত পৌঁছে ফ্লাইটটা ধরতে হবে। তাহলে উপায়, প্রধানমন্ত্রীর কপালের বলিরেখাগুলি আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ডক্টর মুখার্জির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। আর উনি না থাকলে মিটিংটা ভেস্তে যাবে। মিস্টার মেনন বললেন, একটা কাজ করতে পারি। আপনার নাম করে মিসেস মুখার্জিকে ফোন করে অনুরোধ করতে পারি উনি ডক্টর মুখার্জিকে যেন সাড়ে চারটার সময় গাড়িতে তুলে দেন। বেশ তাই করুন, প্রধানমন্ত্রী বললেন। শান্তকে থামিয়ে দিয়ে রত্না বলতে সুরু করলো - আমি তো ঘাবড়ে গেলাম পি-এম-ও থেকে ফোন পেয়ে। প্রথমে হিন্দিতে, পরে ইংরাজিতে বললো মিস্টার মেনন আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। মিস্টার মেননের নাম শুনেছি। তবে আগে কখনো কথা বলিনি। যাইহোক মঙ্গলবার রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। উঠছি আর ঘড়ি দেখছি। শেষে তিনটার সময় গিজার অন করে চায়ের জল বসালাম। তারপর এনাকে ঠেলে তুললাম। ৪টা ১৫র সময় একদম রেডি। গাড়ি ঠিক সাড়ে চারটের সময় এলো। অজিত মাঝে মাঝে মিটিমিটি হাসছিলো। এবার বললো - শেষটা আমি বলি। প্রধানমন্ত্রী ঠিক এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এলেন। মিস্টার মেননের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, So Dr Mukherjee you are in time today!

শান্ত হাতঘড়ি দেখে বললো - আরও মিনিট কুড়ি আছে আমাদের পৌঁছতে। বাসের পিছন থেকে শিবশংকর বললো - আমি আমার একটা গল্প বলবো। শান্ত বললো - তুই সামনে চলে আয়। ঘাড় ঘুরিয়ে গল্প শোনা যাবে না। শিবশংকর আরম্ভ করলো - রেজাল্ট বের হবার কয়েকদিনের মধ্যে আমি দুর্গাপুরের ডি-এস-পি স্কুলে চাকরি পেয়ে গেলাম। দুর্গাপুরে চার বছর ছিলাম। তারপর কলকাতার আশুতোষ কলেজে জয়েন করি। বছর তিনেক দুর্গাপুরে হয়ে গেছে। একদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পরে কোয়াটারে ফিরে দেখি সিঁড়িতে দু-জন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তাঁরা বললেন যে তাঁরা চন্দননগর থেকে এসেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি জানতাম চন্দননগরের এক উদীয়মান গায়িকার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তাদের খাতির করে ঘরে বসালাম। বাড়ির কাছে একটা দোকান এই সময় খুব ভালো জিলিপি ভাজে। ওদের বসিয়ে রেখে এক সের জিলিপি এনে ওদের সামনে রাখলাম। কথায় কথায় জানা গেল ওঁরা মেয়েটির কাকা, কাকী আর মেসো। তাঁরা মেয়েটির নানা গুনের কথা সবিস্তারে বলতে সুরু করলেন আর আমি একমনে জিলিপি খেয়ে চললাম। ওঁরা তিনজন মিলে বোধহয় ছ-টা কি সাত-টা জিলিপি খেয়েছেন, বাকিটা আমি শেষ করে দিলাম। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রাত্তিরের খাওয়া কি হয়ে গেল? আমি বললাম, না মানে আজ রাত্তিরে কয়েকটা রুটি কম খাব। মেয়েটির মেসো জানতে চাইলেন, তার মানে? আমি বললাম, রাত্তিরে আমি আঠারোটা রুটি খাই। যেদিন মেজাজ গরম থাকে সেদিন ছাব্বিশটা রুটি খেয়ে থাকি। আজ চোদ্দটা হলেই চলবে। মেয়েটির কাকা জানতে চাইলেন, এই রুটি তৈরি করে কে? আমি বললাম, যেখান থেকে জিলিপি আনলাম তার পাশে একটা লোক রাত আটটা থেকে রুটি তৈরি করে। ওখান থেকে কিনে আনি। তবে বিয়ে হলে বউ নিশ্চয়ই তৈরি করে দেবে। এ কথা শুনে তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করে বললেন, আজ আসি। সেই যে আসলেন আর কোনো দিন যোগাযোগ করেন নি।

শুক্লা শিবশংকরের বউ-এর দিকে তাকিয়ে বললো - এখন শিবু কটা রুটি খায়? মুক্তা জবাব দিলো - আটটা। আমি রাতে দশটা রুটি করি। তবে মাঝে মাঝে সব খেয়ে ফেলে বলে সরি তোমার জন্য কিছু রইলো না দেখছি। শুক্লা মুক্তাকে বললো - ছেলেরা এমন বে-আক্কেলে কি করে হয় বল তো। কোনো মেয়ে কখনও সব খেয়ে নিয়ে বরকে বলবে না সরি। তারপর প্রবীরকে বললো - এই যে বৈজ্ঞানিক, জিন ফিন নিয়ে অনেক পেপার লিখেছ শুনেছি। ছেলেদের এই বে-আক্কেলে হওয়ার পিছনে কোন জিনটা আছে? প্রবীর বললো - এই বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে এটা ভেবে দেখা যেতে পারে।

শান্ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো - আমরা এসে গেছি। এখানে একটা বড় পুকুর আছে। তাতে একটা বোটও আছে। তোমাদের সকলকে অনুরোধ কেউ জলে নামবে না।

(৩)

বাঃ জায়গাটা ভারি সুন্দর। এত গাছপালা, তার পাশে কতটা খোলা জায়গা। কলকাতায় কংক্রিটের জঙ্গলে ভারটিকাল বস্তিতে থাকি। আজকে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। কি করে খুঁজে বার করলি এমন জায়গা - বিভাস জানতে চাইলো। শান্ত বললো - এটা আমার বন্ধুর বাগানবাড়ি। আমি এখানে আগে এসেছি। সকলের জন্য চেয়ার আছে। তবে ইচ্ছা করলে ঘাসে বসতে পারো। সামনের টেবিলে চা কফি আছে। ইচ্ছামত নিয়ে নিও। ফুরিয়ে গেলে আবার ভর্তি করে দেওয়া হবে। মন্দিরা বললো - আজকে কখন কি হচ্ছে বলবে? শান্ত বললো - ঠিক সাড়ে বারোটার সময় স্টাটার - ফিস ফ্রাই আর টমেটো সুপ। একটা থেকে আড়াইটা লাঞ্চ। বিকেলে কফি ও তার সঙ্গে ভাজাভুজি। আমরা চেষ্টা করবো পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ার। তবে আসল কাজ আড্ডা দেওয়া। অরূপ, তুই বাসের ড্রাইভার আর হেল্পারকে খাইয়ে দিস। ঐ বড় থলেটার মধ্যে খেলার জিনিস আছে। যাদের ইচ্ছা, শরীর বুঝে খেলতে পারো।

বাদল বললো - শান্ত তোর হাতে হাতকড়া না পড়ে। কেন - শান্ত জানতে চাইলো।
- দেখছিস না বুড়োবুড়িগুলি কেমন হাম হাম করে খাচ্ছে। রাতে কেউ পটকে না যায়।
- আরে ছেড়ে দে। এদের কারুর সুগার, কারুর প্রেশার, কারুর বা ঘাড়ে ব্যথা। সারা বছর নিয়মে থাকে। ভালো করে খায় না। পেনসনের টাকার বেশিটা খরচ করে ওষুধে। একদিন অনিয়ম করলে কিছু হবে না। আমি এক বোতল কার্মোজাইম আর কুড়িটা জেলুসিল নিয়ে এসেছি।

শান্ত গলা তুলে বললো - আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই খাওয়া শেষ করো। খেয়ে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর cultural programme এর ব্যবস্থা আছে। ঘরে একটা হারমোনিয়াম রাখা আছে। সেটা ব্যবহার করে যেতে পারে। রজত পান চিবতে চিবতে বললো - এত খাবারের আয়োজন করেছিস কেন? শান্ত বললো - আমি কিন্তু নজর করেছি তুই সব আইটেম খেয়েছিস। নন-ভেজ খেয়ে ভেজ টেবিল থেকে খাবার নিয়েছিস। বাজে না বকে গান করার জন্য তৈরি হ। আমার লাল ব্যাগটার মধ্যে একটা গীতবিতান আছে।

(৪)

সকলে তাড়াতাড়ি কফি শেষ করো। অন্ধকার হয়ে আসার আগে এখান থেকে রওনা হতে হবে - শান্ত বললো। আমরা অনেকে গান করলাম, কবিতা পড়লাম, শান্তদা আপনি কিছু করলেন না - জয়া বললো। শান্ত বললো - এই যে আমি সব ব্যবস্থা করলাম, এতো বছর পর সকলকে খুঁজে বার করলাম এটা বুঝি কিছু নয়? জয়া বললো - আমি তা বলিনি। তবে আপনার নাচ দিয়ে আজকের রিইউনিয়ান শেষ হলে ভালো হয়। নাচ? আমি নাচবো? শান্ত একটু বিস্ময়

প্রকাশ করলো। হ্যাঁ, একসময় তো নাচতেন। তাই না? জয়া বললো। তুমি কি করে জানলে - শান্ত জানতে চাইলো। জয়া সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো - জুতো খুলে তৈরি হয়ে নিন। চল্লিশ বছর আমি নাচিনি। অনভ্যাসে তাল কেটে যাবে। হাত পা কথা শুনবে না - শান্ত বললো। শুক্লা রূপার দিকে তাকিয়ে বললো - হ্যাঁ রে রূপা তোর বরের নাচ দেখেছিস? তিরিশ বছর ঘর করছি। ও যে নাচতে পারে তা আমি কোনোদিন শুনিনি। আজই প্রথম জানলাম। এমনকি কোনোদিন আমরা নাচের অনুষ্ঠান দেখতে পর্যন্ত যাইনি - রূপা বললো। জয়া বললো - আমি গান করছি, আপনি নাচ সুরু করুন। শান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কি রে স্ট্যাচু হয়ে গেলি যে। নে নে সুরু কর - সুবীর গলা তুলে বললো। জয়া গান সুরু করলো - আকাশ জুড়ে শুনিনু .. । শান্ত বিড় বিড় করে নিজেকেই বললো - কি আশ্চর্য চল্লিশ বছর আগে শেষবার এই গানের সঙ্গে নেচেছিলাম। শান্ত একবার করে সবার মুখের দিকে তাকালো। সকলের চোখেমুখে বিস্ময়। শান্ত নাচ সুরু করলো। একসময় নাচ শেষ হলো। গুরু, চল্লিশ বছর অনভ্যাসে তোর এই ফর্ম, তাহলে চল্লিশ বছর আগে কি ছিলো? নাচটা ছাড়লে কেন চাঁদু? কলেজে ছেলেদের ফিজিক্স না শিখিয়ে এই নাচটা ধরে রাখলে অনেক নাম করতে পারতে - অরুণ মন্তব্য করলো। অরূপ বললো - আমার সব কেমন গোলমাল ঠেকছে। রূপা জানেনা তার বর এত ভালো নাচতে পারে। আমিও জানিনা অথচ আমার বউ জানে শান্ত একসময় নাচতো। জয়ার শান্তকে চেনার কোনোও সম্ভাবনা নেই। কেসটা বেশ গোলমালে। আমাদের সাসপেন্সে না রেখে একটু ঝেড়ে কাশতো বাপু। শান্ত বললো - বহুদিন পর আমরা এক জায়গায় হয়েছি। আজকে এইসব পুরোনো কথা থাক না। বিপ্লব বললো - দ্যাখ আজ আমরা সবাই বুড়োর দলে। এর পরের রিইউনিয়ানের সময় দু-একজনকে উপর থেকে দেখতে হতে পারে। গল্পটা আজই হয়ে যাক। না হলে বাড়ি গিয়ে ঘুম হবে না। জয়া তুমিও দেখছি যে মুখ বন্ধ করে বসে আছ। শান্ত বললো - আমি বুঝতে পারছিনা জয়া কেমন করে জানলো আমি এক সময় নাচতাম। তার বিচার পরে হবে - ভাস্কর বললো। সবার চোখ শান্তর দিকে। শান্ত আস্তে আস্তে বলতে সুরু করলো। খুব ছোটবেলা থেকে আমার নাচের শখ। রেডিয়োতে গান শুনে আমি নিজের মতন করে নাচতাম। আমাদের কয়েকটা বাড়ি পরে এক মহিলা থাকতেন, তাকে আমরা বেলামাসি বলতাম। তিনি পাড়ার বাচ্চাদের শনি আর রবিবার নাচ শেখাতেন। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন মা আমাকে বেলামাসির স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বছর পাঁচ বেলামাসির কাছে নাচ শিখেছিলাম। তারপর বেলামাসি নিজেদের বাড়ি তৈরি করে সল্টলেক চলে গেলেন। কিছুদিন নাচ শেখা বন্ধ থাকলো। এরপর মা বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমি বাচ্চাদের দলে ভর্তি হলাম। গুরুজী ছিলেন বিপত্নীক। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। আমার চেয়ে ছয় সাত বছরের বড়। বাচ্চারা সকলে তাকে বড়দি বলে ডাকতো। দেখাদেখি আমিও বড়দি ডাকতাম। বড়দি তিন বছর বয়স থেকে গুরুজীর কাছে তালিম নেওয়া সুরু করে। আমি প্রথম যখন দেখি তার বয়স তখন চোদ্দ পনেরো। কিন্তু তার মধ্যে সে নাচে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলো। বড়দি মাঝে মাঝে গুরুজীর এ্যাসিস্টেট হয়ে আমাদের নাচও শেখাতো। বছর দুই পরে আমাদের দলে আর একটা ছেলে যোগ দিলো। তার নাম রাহুল। আমার চেয়ে

তিন বছরের বড়। দেখতে ভারি সুন্দর। গানের গলা খুব ভালো। আর চমৎকার বাঁশি বাজাতো। এর আগে অন্য কোথাও নাচ শিখতো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেল। মাঝে মাঝে গুরুজী রাহুলকে নিয়ে আলাদা করে শেখাতেন। আমার সঙ্গে রাহুলের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মালা বাধা দিয়ে বললো - তার মানে আমরা যখন একসঙ্গে পড়তাম তখনও তুমি নাচতে। অথচ আমরা কিছুই জানতাম না। শান্ত বললো - নাচতাম মানে? তখন বেশ কতগুলি প্রোগ্রাম রবীন্দ্রসদনে করা হয়ে গেছে। কেন জানিনা বেলামাসি আমাকে রাজা বলে ডাকতেন। সেই থেকে নাচের জগতে আমার নাম হয়ে যায় রাজা। প্রোগ্রামে আমার নাম রাজা বলে ছাপা হতো। অরূপের হয়তো মনে আছে আমি মাঝে মাঝে প্রাক্টিক্যাল ক্লাসে ডুব দিতাম। অনুষ্ঠানের আগে স্টেজ রিহার্সাল দুপুরে হতো, তখন প্রাক্টিক্যাল ক্লাস করা সম্ভব হতো না।

এই সময় একদিন গুরুজীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হলো, আর ডান দিকটা পড়ে গেলো। নাচার আর ক্ষমতা রইলো না। বড়দি তখন স্কুলের ভার নিজের হাতে তুলে নিলো। গুরুজীকে ধরে ধরে নাচের ক্লাসে নিয়ে আসা হত। তিনি চুপ করে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে গুরুজী বড়দিকে ইশারায় কি যেন বলতেন। আমরা সেটা বুঝতাম না। বড়দি সেটা বুঝতে পারতো। বছর খানেক এই ভাবে চললো। একদিন আমাদের রিহার্সাল চলার সময় গুরুজীর একটা ম্যাসিভ অ্যাটাক হলো। সেটা আর তিনি সামলাতে পারলেন না।

এই সময় বড়দি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সঙ্গে নাচের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের দিয়ে করাচ্ছিলো। আমাদের দলের প্রথম অনুষ্ঠান শ্যামা রবীন্দ্রসদনে হয় তখন আমি পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছি। আমরা প্রায় চার মাস রিহার্সাল দিয়েছিলাম। বড়দি মনে করতো, নৃত্যনাট্যে সকলে সব নাচ না জানলে তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। প্রায়ই বলতো পাঁচটা প্রশ্ন মুখস্থ করে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিষয়টা শেখা হয় না। বিষয়টা শিখতে হলে পুরো বইটা পড়া একান্ত প্রয়োজন। তাই রিহার্সালের সময় আমি অনেকবার শ্যামা বা সখিদের ভূমিকায় নেচেছি। তেমনি বড়দি বজ্রসেন এমনকি কোটালের ভূমিকায় নেচেছে। শান্তর দম নেবার সুযোগে দেবপ্রিয় মন্তব্য করলো - আমি কিন্তু প্রতি পেপারে সাত আটটা প্রশ্ন মুখস্থ করে ডিগ্রি পেয়েছিলাম। সারা জীবনে ওগুলি কোনো কাজে লাগেনি। ব্যাঙ্কের কাজে যোগ, বিয়োগ, গুণ আর ভাগ জানলেই কাজ চলে যায়। সমীর পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলো। তার থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বার করে দেবপ্রিয়র দিকে তুলে ধরে বললো - তোর বাতেলা দেবার স্বভাবটা চল্লিশ বছরে একটুও পাল্টায়নি। I promise to pay এর নীচে D Banerjee সইটা কার হতভাগা? শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ আর ভাগ জেনে অথবা না জেনে মন্ত্রী হওয়া যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হওয়া যায় না। অসিত ডান হাতটা উঁচু করে বললো - অর্ডার, অর্ডার! এখন তর্ক বিতর্ক নয়। শান্ত তুই থামিস না। গল্পটা শেষ কর। শান্ত আবার সুরু করলো। বড়দি বলতো নাচের মধ্যে একটা অভিনয়ের জায়গা আছে। তাল ঠিক করে নাচলেই সেটা সার্থক নাচ হয় না, যতক্ষণ না অভিনয় নিখুঁত হয়। প্রতিটা ধাপে বড়দি নিজে অভিনয়

করে দেখাতো, কেমন করে তাকাতে হবে, মুখের হাসিটা কেমন হবে। আমার মনে আছে একবার রাহুলকে বলেছিলো, প্রেমিকার দিকে কি করে তাকাতে হয় এখনও শেখো নি। বলে নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছিল। অরূপ বললো - যে সব ছেলেরা নাচে তাদের হাঁটাচলার মধ্যে সেটা প্রকাশ পায়। তোর চলাফেরার মধ্যে সেটা ছিল না। তোর সঙ্গে কলেজের মধ্যে ও বাইরে কত আড্ডা দিয়েছি। ক্রিকেট, ফুটবল নিয়ে কত আলোচনা হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু নাচ গান নিয়ে কখনও কোন কথা হয়নি। তুই গান করিস না? শান্ত বললো - আমার গলায় সুর যে নেই তা নয়। তবে গানের গলা তেমন ভালো নয়। একলা থাকলে অনেক সময় মনে মনে গান করি। তবে নাচই আমার বেশি প্রিয়। যাই হোক ভূমিকা অনেকটা হয়ে গেছে। এবার তোমাদের কৌতূহল মেটানো দরকার।

সেদিন ছিল শনিবার। আসল রিহার্সাল হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে। আমি আর রাহুল রয়ে গেছি। আমরা টেপ বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ অভ্যাস করতাম। রাহুল হঠাৎ বললো, টেপটা বন্ধ কর। আমি গান করছি, তুই নাচ। আধঘণ্টা এ-রকম চললো। আমি বললাম, আজ থাক। ক্লান্ত লাগছে। আমি মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মিনিট দশেক পর রাহুল বললো, চল বড়দির সঙ্গে একটু দরকার আছে। তারপর বাড়ি যাওয়া যাবে।

আমরা দুজনে অফিস ঘরে ঢুকলাম। বড়দি কিছু একটা লিখছিলো। আমাদের দেখে হেসে বললো, কি ব্যাপার মানিকজোড়। রাহুল দু-পা এগিয়ে গেল। কোনোরকম ভূমিকা না করে বললো, বড়দি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। বড়দির সারা শরীরের রক্ত যেন মুখে উঠে এলো। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাহুলের গালে একটা চড় কশিয়ে বললো, ইতরামি করার আর জায়গা পাওনি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কি তুমিও আমাকে বিয়ে করতে চাও? আমাকে কি দ্রৌপদী হতে হবে নাকি? আমরা কেউ কোনো উত্তর দিলাম না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম বড়দি দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়েছে। বড়দির বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি হাঁটলে মিনিট পঁচিশ লাগে। কিছুটা হাঁটার পর রাস্তাটা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে আমাদের বাড়ির পথ আর ডান দিকে রাহুলের। সারা রাস্তা আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো কথা হলো না। আমার জীবনে দু-একবার হয়েছে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। এটাও ছিলো সে রকম একটা রাত। পরদিন রোববার। আমাদের বহরমপুর যাবার কথা। মাসতুতো দিদির বিয়ে। তিন দিন পর সন্ধ্যাবেলায় যখন আমরা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম তখন দেখলাম রাহুলের ভাই প্রতুল দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বললো, দাদাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। দুদিন পর শ্রীরামপুরের কাছে গঙ্গায় একটা মৃতদেহ ভেসে উঠলো। ফুলে উঠেছে। চেনা যায় না। রাহুলের বাবা পিঠের একটা কাটা দাগ আর গলার আঁচিল দেখে দেহ সনাক্ত করলেন।

মর্গ থেকে আমরা দেহটা পেলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। কেওড়াতলায় সব কাজ শেষ যখন হলো তখন সূর্য ডুবে গেছে। রাহুলের বাড়ির লোকজন ছাড়া শ্মশানে আমাদের দলের অনেক ছেলেমেয়ে ছিলো। বড়দি আর আমি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানের গেট দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। বড়দি বলে উঠলো, আমার ডান হাতটা চলে গেলো। এক হাতে কি করে দল চালাবো? তারপর আমাকে বললো, এ সপ্তাহ রিহার্সাল বন্ধ থাকুক। তারপর আবার সুরু করা যাবে। আমি বড়দির দিকে না তাকিয়ে বললাম, আমি আর নাচব না - তোমার দলেও না, আর কারুর দলেও না। বড়দিকে আর কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। অরূপ জিজ্ঞাসা করলো - বড়দির সঙ্গে আর তোর কখনও দেখা হয়নি? শান্ত বললো - বড়দি কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলো। আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তোদের নাচের দলের কি হলো - দেব জানতে চাইলো। শান্ত বললো - জোড়াতালি দিয়ে কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়েছিলো বলে শুনেছি। বছর দেড়েক পর বড়দির বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর পাকাপাকি টোরন্টোবাসি হয়ে গেলো। দলও ভেঙে গেলো। আমাকে বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছিলো। আমি যাই নি। শুনেছি টোরন্টো আর নিউইয়র্কে দুটো নাচের স্কুল খুলেছিলো। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে নিউইয়র্ক যেতো আর সোমবার টোরন্টো ফিরে আসতো। তোমার সঙ্গে বড়দির আর কোনোদিন দেখা হয়নি - শুক্লা জানতে চাইলো। শান্ত বললো - বছর দশ আগে আমি নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। রূপা সঙ্গে ছিলো। একদিন একটা সুপারমার্কেটে দূর থেকে বড়দিকে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে আমি সুপারমার্কেট থেকে বের হয়ে আসি। জানিনা বড়দি আমাকে দেখেছিলো কি না। জয়া এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে শুনছিলো। এবার সে মাথা তুলে বললো - গল্পের বাকিটা আমি বলছি। জয়া একবার শান্তর দিকে ও পরে অরূপের দিকে তাকিয়ে সুরু করলো - শান্তদার গুরুজীর স্ত্রী মারা যান দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। স্ত্রীকে হারিয়ে গুরুজী ভীষণ বিপদে পড়লেন। তখন তাকে উদ্ধার করলেন তাঁর স্ত্রীর নিঃসন্তান দিদি। তিনি হাসপাতাল থেকে বাচ্চাটিকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। আইন মতো দত্তক নিলেন। আর ভগ্নীপতির সঙ্গে এক মুখের চুক্তি করলেন, তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকবে না। গুরুজী তাতে রাজি হলেন। জয়া শান্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো - শান্তদা, বড়দির নাম কি ছিলো? শান্ত উত্তর দিলো - বিজয়া। জয়া আবার সুরু করলো - বিজয়া মাঝে মাঝে একটা খাতায় তারিখ দিয়ে তার মনের কথা লিখে রাখতো। এটা ঠিক ডাইরি নয় ছোট গল্পের ঢঙে এক একটা ঘটনা। বছর আট আগে বিজয়ার কোলনে ক্যান্সার ধরা পড়লো। ডাক্তাররা কাটাছেঁড়া করলেন। বিজয়া একটু সুস্থ হলো। ডাক্তাররা খুব বেশি আশা দিতে পারলেন না। বিজয়া তার বোনকে কখনো দেখেনি। মনে পড়ে তার মা হাসপাতালে গেলেন কিন্তু আর ফিরলেন না। তখন তার বয়স আট বছর। সম্ভবত তার বাবা মৃত্যুর আগে কিছু বলে থাকবেন অথবা বাড়িতে কোনো কাগজপত্র পেয়ে থাকবে। যাইহোক সে টোরন্টো থেকে এদেশে এলো এবং বোনের অফিসে হাজির হলো। কি করে বোনের সন্ধান পেয়েছিলো সেটা আমার জানা নেই। দুজনের দুজনকে চিনতে অসুবিধা হলো না। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য রকম মিল। একই রকম কথা বলার ভঙ্গি। হাসলে বা-গালে টোল পড়ে। দুজনেই বাঁ-হাতে লেখে।

এর বছর দুই পরে বিজয়ার বোন একটা প্যাকেট পেলো ডি-এইচ-এল মারফত। তার মধ্যে তিনটে মোটা মোটা খাতা, সম্বোধন বিহীন ইংরাজিতে লেখা একটা চিঠি - বিজয়া চেয়েছিলো তার মৃত্যুর পর আপনাকে এই খাতাগুলি যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করলাম। খাতাগুলির গায়ে সিলোটেপ জড়ানো ছিল। মনে হয় বিজয়া চায় নি আমি খাতাগুলি দেখি। তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে আমি খাতাগুলি যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। জয়া একটু থেমে দম নিয়ে নিলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজলো। তারপর আবার সুরু করলো। খাতার শেষ এন্ট্রিটা মারা যাবার ঠিক পনেরো দিন আগের লেখা - যমরাজ পরওয়ানায় সই করে চিত্রগুপ্তকে ফাইলটা দিয়ে দিয়েছেন। এবার সেই ফাইল নিজের নিয়মে নানা দপ্তর ঘুরে যমদূতদের কাছে কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। জীবনে একটা আক্ষেপ রয়ে গেলো যে আমার জন্য দু-দুটো প্রতিভার অপমৃত্যু হলো। রাহুলকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আমার ছিলো, কিন্তু অপমান করার অধিকার আমাকে কেউ দেয় নি। ক্ষণিকের উত্তেজনায় যে কাজ করে ফেলেছিলাম তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ রাহুল আমাকে দিলো না। আর একজন তার প্রিয় বন্ধুর শেষ পরিণতির জন্য আমাকে দায়ী করে কার উপর শোধ নিলো জানিনা। দেখেছি কেউ মারা গেলে তার আত্মার শান্তি কামনা করে নানা আচার অনুষ্ঠান, স্মরণ সভা হয়। আত্মা আছে কিনা জানিনা, সে শান্তি পায় কিনা তাও জানিনা। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে এবং শান্ত যদি একবার সবার সামনে নাচে তাহলে আমি সত্যি শান্তি পাবো। জয়া বাঁ-হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো ঢাকলো। আর চোখের জল লুকোবার জন্য মাথা নিচু করলো। সুকন্যা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো - বড়দির বোনের নাম কি ছিলো? জয়া প্রায় ফিস ফিস করে উত্তর দিলো - জয়া।

July 2011